ঢেং কুন শেখে



শ্রীধীরেন বল

পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা শিক্ষা অধিকর্তা কর্তৃক
দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য অনুমোদিত

ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি
কলিকাতা-১২

ওরিয়েন্ট সংস্করণ : ১৯৫৭
দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৯৬৪

চিত্রশিল্পী :
শ্রীধীরেন বল

প্রচ্ছদ মুদ্রণ :
মোহন প্রেস
২ করিস চার্চ লেন
কলিকাতা ৯

প্রকাশক :
শ্রীপ্রহলাদকুমার প্রামাণিক
৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা ১২

মুদ্রাকর :
শ্রীধনঞ্জয় প্রামাণিক
সাধারণ প্রেস
১৫এ ক্ষুদিরাম বোস রোড
কলিকাতা ৬

উপহার



আদরের রেবা ও সুজুকে

—বড় কাকা

গোড়ার কথা

এই বইয়ের গোড়ায় একটা কথা বলা নেহাৎ প্রয়োজন। ছবি দিয়ে গল্প বলার অভিজ্ঞতা যেটুকু লাভ করেছি, তার প্রথম সূচনা এই 'ঠেকে হাবুল শেখে' ব্যঙ্গ-চিত্রের মাধ্যমেই। ঠেকে ঠেকে শ্রীমান হাবুলচন্দ্রের শিক্ষালাভ ব্যাপারটা ছোটদের কাছে কম লোভনীয় নয়।

এই রকম একখানি মনোরম শিশুচিত্তহারী বইয়ের আকার লাভ করবার জন্যেই যেন গল্পটি অপেক্ষা করছিল। এই দুরূহ কাজের জন্যে আগ বাড়িয়ে এলেন বন্ধুবর শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি যে অসাধ্য সাধন করেছেন, তা যে-কেউ বইখানি হাতে তুলে নিলেই বুঝতে পারবেন। পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ে কোনো কার্পণ্যই করেন নি তিনি।

মনে হয় বইখানি ছোটদের কাছে সত্যিই লোভনীয় হয়েছে। তারা কি ভাবে সাড়া দেয়—সেটাই এবার লক্ষণীয়।

কলিকাতা
এপ্রিল, ১৯৬৪



হাবুলকে চেনো তোমরা?—আমাদের পাড়ার হাবুলকে? দেড়-আঙুলে ছোট্ট ছেলে, বাপ্‌রে কী ডানপিটে! বাবা, মা, মেজদা কি মাষ্টারমশাই কেউ এঁটে উঠতে পারেন না এই হাবুলের সঙ্গে। দিনরাত শুধু দস্যিপনা! কারু কোনো ভালো কথা কানে নেবে না, খালি-সারাদিন টো টো—টো টো! আর হৈ হৈ—রৈ রৈ!

আজ এর ফলচুরি। কাল ও-বাড়ীর

ছেলের সঙ্গে মারামারি। পরশু অমনি একটা অন্যায় কিছু। হাবুলচন্দ্রের এই শুধু কাজ। কোনো ভালো কথায় ওর শিক্ষা হলো না। বাবা-মা ভেবে ভেবে সারা, কিসে ওর মতি ফিরবে !

ওর বন্ধু বাবলু কিন্তু তেমনটি নয়। বড় ভালো ছেলে এই বাবলু। কতো যে বুঝিয়েছে বাবলু হাবুলকে, কিন্তু নাঃ, কোনো পরিবর্তন নেই হাবুলের।

বাড়ীতে একদণ্ড বই নিয়ে পড়তে বসবে না হাবুল। সারাদিন যদি খেলা হয় তো বেশ ! বাড়ীতে কয়েকটা অঙ্ক কষতে দিয়েছেন স্কুলের মাষ্টারমশাই। হাবুল সবে তাই নিয়ে বসেছে, এমন সময় বাইরে থেকে তার সঙ্গী-সাথীদের খেলার হৈ-হল্লা কানে

এলো। হাবুলের মন আর অঙ্কের খাতায় নেই। ছুটে গেছে বাইরে।

ছোট্ট খোকন দাদাকে খুব ভালোবাসে কিনা, তাই দাদ্দা—দাদ্দা বলে কাছে বসে একমনে দেখছিল সে দাদার অঙ্ককষা। কিন্তু দাদার মনটি রয়েছে সেই বাইরে। ভাবে—ওরা সবাই খেলছে, আমার আর একটা আঁক কষতে বাকি। তারপর যেই কোন রকমে তা শেষ করেছে, অমনি এক ছুটে হাবুল তার খেলার সঙ্গীদের দলে।

—এই আমি এসেছি— আমিও খেলবো।

রইলো পড়ে বই-খাতা, রইলো দোয়াত-কলম, কাগজ-পেন্সিল। হাবুল একেবারে খেলায় মশগুল!





এদিকে খোকন দেখে ভারী মজা তো! যেই দাদা উঠে গেছে, অমনি খোকন একেবারে দাদার জায়গা-টিতে। দাদার দোয়াত-কলম নিয়ে দাদার কষা অঙ্কের ওপরই সে—দাদ্দা—দাদ্দা—বলে হিজি-বিজি কাটতে বসে গেল। হাবুলের কষা অঙ্কের যা দশা হলো, তা আর বলে বোঝাতে হবে না।

এদিকে স্কুলের বেলা হয়েছে। হাবুল তাড়াতাড়ি খেলা ছেড়ে এসে, নেয়ে খেয়ে বই-পত্তর নিয়েই স্কুলে ছুট। ক্লাসে অঙ্কের মাষ্টারমশাই তো খাতা খুলেই চক্ষুস্থির!

—হাঁরে হাবুল, তোর আঁকের খাতায় এ হিজিবিজি কেটেছিস কেন রে?

হাবুল সত্যিই কিছু জানে না। তবু আঁচ করে নিয়ে বলে—ও তবে খোকনের কীর্তি স্যর।



রেগে মাষ্টারমশাই দাঁড় করিয়ে দিলেন হাবুলকে বেঞ্চির ওপর। হাবুলের ভারী কান্না পায়!

বাবলু বলে—খোকনের দোষ কি? তুই নিজে অসাবধানা!

হাবুল ঠেকে শেখে! বলে—তা ঠিক! কিন্তু আর নয়! এখন থেকে সাবধানী হবো।



স্কুলে মাষ্টারমশাই সব ছেলেকে কতো ভালো ভালো উপদেশ দেন। অনেক ছেলেই তা মনে রাখে। আর সেই মত চলতে চেষ্টা করে। কিন্তু হাবুলের সে-সব উপদেশ এক কান দিয়ে ঢুকে অন্য কান দিয়ে বেরিয়ে যায়। কিছুই মনে রাখে না হাবুল।

সেদিন বিকেলে স্কুল ছুটির পর বাড়ীতে এসে জলখাবার খেয়ে, তার টেবি কুকুরকে সঙ্গে নিয়ে মাঠের দিকে বেড়াতে বেরুল হাবুলবাবু। দেখে দূরে মাঠের একপাশে বাবলু বসে তার রঙীন ঘুড়িখানা ওড়াচ্ছে। ঘুড়িখানা দেখে হাবুলের ভারী লোভ হলো। সে মনে মনে বলতে লাগলো—বাঃ! বেশ ঘুড়ি বাবলুর! আমি পেলে ওড়াই !!

হাবুলকে দেখতে পেয়ে বাবলু ডাকলে—আয় হাবলু, ওড়াবি ?



ডাক শুনে খুশী মনে হাবুল বলে—হাঁ, এই যাচ্ছি ! তার পর



কী মজা ! আয়।

কিন্তু অমনি করে আর বেশী দূর এগোতে হলো না হাবুলকে। পথেই পড়ে ছিল একটা শুক্‌নো



গাছের গুঁড়ি। পড়বি তো পড়, একেবারে গিয়ে ধপাৎ—তার ওপর। উঃ মাগো! —বলে চীৎকার করে উঠলো হাবুল। তাড়াতাড়ি ছুটে এলো বাবলু।

এঃ, কপালটা একেবারে গোল আলুর তো ফুলে উঠেছে! কী আর হবে? সান্ত্বনা দিয়ে বাবলু বলে—মাষ্টারমশাই যে বলেন—সব দিকে চোখ রেখে চলবে, তা তুমি সে-উপদেশ ভুলে যাও

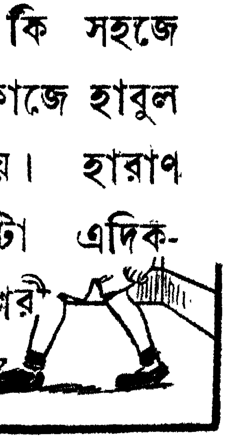


কেন? দেখলে তো তাঁর সে-উপদেশ ভুলে যাবার ফলটা?

হাবুলের চোখ দিয়ে জল আসছিল। খুব লজ্জা পায় হাবুল। আর আফশোষও হয় খুব। বলে—আর কখনো ভুলবো না ভাই!

হাবুল এবার ঠেকে শেখে যে—সব দিকে চোখ রেখে চলতে হবে।

কিন্তু সর্ব্বদা অস্থির যে,—স্বভাব যার দুষ্টুমি করা, তার শিক্ষা কি সহজে হয়? বাবলুর সঙ্গে কী একটা কাজে হাবুল সেদিন গিয়েছিল পাশের গাঁয়ে। হারাণ মণ্ডলের গাইয়ের নতুন বাছুরটা এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করছে। ভারী বাছুরটি! তাই দেখে আন



বলে—বাঃ, বেশ বাছুরটি ত!



হাবুল অমনি বলে ওঠে—আমি ধরবো ওকে!

বাবলু বারণ করে। কিন্তু কে শোনে কার কথা? ততক্ষণে বাছুর-টাকে ধরে ফেলেছে হাবুল। দু'কান ধরে হিঁড়্ হিড়্ করে টানতে টানতে হাবুল বলে—একে ধরে নিয়ে যাই। বেশ মজা হবে!

বাছুরটা তো কিছুতেই যেতে চায় না। হাবুলও তা বান্দা! উপদেশ ভুলে— র



কানে ধরে টানতে
নেই। ওতে ওরা
কষ্ট পায়!

হাবুল সে-
কথায় কানই
দেয় না।

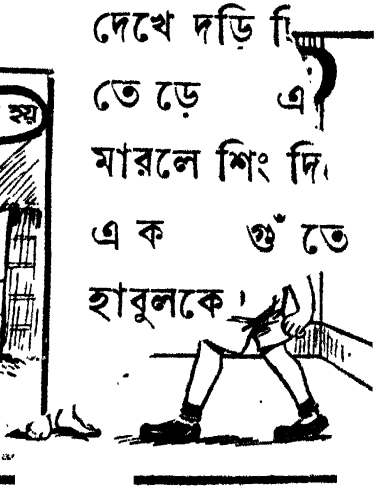
—হুস্!—
পাশেই দড়িতে
বাঁধা ছিল
হারাণের গাইটা।



.খন তখন
উঠবে কেন

হাবুলের
কে শুনে
কাজটা
ছ এসে
টে গেল
হয়রান,
বাছুরকে অমনি
টেনে নিয়ে।
দেখে দড়ি
তে ড়ে এ
মারলে শিং দি
এক গুঁতে
হাবুলকে।







গর্বে ফুল দেখে হাবুল। এঃ!
বেশ খানিকটা কেটেও গিয়েছে!
বাবলু। পরণের কাপড় ছিঁড়ে
বেঁধে দেয় ওর কাটা জায়গাটা।
খলি ত, অযথা কাউকে কষ্ট

কটা আর বলতে হলো না। কাঁদতে
হাবুলই বলে—হ্যাঁ, নিজেকেও
পেতে হয় তার চেয়েও বেশী কষ্ট!

ধরে
বলে
নিে
ম

মনি বিশ্রী স্বভাব হাবুলবাবুর যে, নিজ
হাতে একটা কাজ করে নেবার নামটি
চৌ খালি—গোপাল, এটা এনে দে!
ওটা এনে দে!
তা তুমি বা— বাচ্চা চাকর। সারাদিন
উপদেশ ভুলে— র একটুও সময়
র

পায় না গোপাল। তার ওপর যখন তখন হাবুলবাবুর এই হুকুম! পেরে উঠবে কেন সে এতো?

আজ সকালে ঘুম থেকে উঠেই হাবুলের চীৎকার—গোপাল, শীগ্‌গীর এদিকে শুনে যা। গোপালের হাত জোড়া। কাজটা সেরে যেই সে হাবুলের কাছে এসে দাঁড়ালো, অমনি তেড়ে মেরে ছুটে গেল হাবুল গোপালকে চড় বাগিয়ে।

—পাজী বেটা! ডেকে ডেকে হয়রান, কোথায় থাকো? মেরে খুন করবো।



গোপাল কি জবাব দিতে যাচ্ছিল। মুখ ভেংচে চেঁচিয়ে ওঠে হাবুল।

—বেরিয়ে যা বাড়ী থেকে! বেরিয়ে যা!

কেঁদে কেটে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল গোপাল।

দশটা বাজে। স্কুলের বেলা হয়েছে। তাড়াতাড়ি স্নান সেরে রান্নাঘরে খেতে আসে হাবুল।

—মা, ভাত দাও, স্কুলের সময় হয়ে গেছে।

মা সব ব্যাপারই জানেন। ইচ্ছে করেই তিনি এতক্ষণ একটি কথাও বলেন নি। এবার গম্ভীরভাবে বলেন—কটুকথা বলে চাকরকে তাড়িয়েছ। নিজে বাসন মেজে আনো, তবে ভাত।



কি আর করে হাবুল। আজ প্রথমেই হেড মাষ্টার মশাইয়ের ক্লাস। ক্লাসে যেতে

একটু দেরী হলে আর রক্ষে নেই। থালা বাসন মাজার চাইতেও বেশী বিপদ সেখানে। তাই মনে মনে বিড়্বিড়্ করে বকতে বকতে সে কুয়োতলায় বাসন মাজতে লেগে গেল। দুঃখু করে বলে—চাকর বেটা আমায় আচ্ছা শিক্ষা দিলে।

মা তো এ-ই চান। রান্নাঘরের জানালা থেকে তিনি সব দেখেন, আর ফোড়ন কাটেন—কেমন জব্দ!

কিন্তু এইতেই সব শেষ হলো না হাবুলের।

সাত - তাড়াতাড়ি খেয়ে দেয়ে যখন সে স্কুলে গিয়ে হাজির হলো, তখন রীতি-মত ক্লাস বসে গিয়েছে। সিঁড়ির ধার থেকেই দেখতে পায় হেড মাষ্টার-





মশাই ক্লাশে এসে পড়াচ্ছেন। ভয়ে ভয়ে যেই ক্লাসে ঢুকতে যাবে, হেড মাষ্টারমশাই গম্ভীর গলায় বলেন—এক ঘণ্টা লেট হলে ক্লাসে ঢুকতে দেওয়া হয় না।

আর উপায় কি? বই-পত্তর সব নিয়ে তক্ষুণি সে বাড়ীর পানে চললো। ভারী কান্না পাচ্ছিল ওর! গোপালের সব কথা ভেবে মনে মনে বলে—কাউকে কটুকথা বলার শাস্তি অনেক!

হাবুলচন্দ্রের আর একদিনের কীর্তির কথা বলি। জ্যৈষ্ঠ মাস। গাছে গাছে পাকা পাকা আম হাওয়ায় দুলছে। হাবুলদের নিজেদের বাড়ীতেই বেশ ভালো ভালো আমগাছ রয়েছে। আমও ধরেছে প্রচুর। কিন্তু আজ কী দুর্মতি হলো হাবুলের!

রায় বাবুদের আম বাগানের পাশ দিয়ে সে যাচ্ছিল। সঙ্গে তার টেবি। ঠিক দুপুরবেলা। পথ-ঘাট নির্জন। হাবুল দেখে গাছ ভর্তি পাকা পাকা আম!



মালী বেটা ঘুমিয়েছে। এই ফাঁকে কয়েকটা আম পেড়ে নিলে মন্দ কি? বেড়া টপকে দেখতে দেখতে হাবুলচন্দ্র ওই গোপাল-ভোগের বড় গাছটার একেবারে মগডালে। একটা টুক্‌টুকে বড় ছড়া পেকে রয়েছে তার নাগালের একটু বাইরে। হাবুলের লোভ ওই বড় ছড়াটার ওপর।

মোটা ডাল ছেড়ে হাবুল পা বাড়ায় একটা সরু ডালে। সর্‌সর্ করে ওঠে পাতাগুলো। পাশেই ছিল মালীর ঘর। মোটেই ঘুমোয়নি সে। বসে বসে খইনি টিপছিল। পাতার সর্‌সর্ শব্দ কানে যেতেই চেঁচিয়ে ওঠে—কেরে?



যেই মালীর গলা কানে যাওয়া, অমনি হাবুল

ভড়্‌কে গিয়ে দিয়েছে হাত-পা ছেড়ে। তার পরেই বুঝছো—ধপাৎ—একেবারে মাটিতে।



হৈ-হৈ করে লাঠি নিয়ে ছুটে বেরিয়ে এলো মালী—দাঁড়া দেখাচ্ছি মজা!

আর দাঁড়াবার শক্তি কোথায় হাবুলের? একেবারে ভুঁয়ে বসে পড়েছে সে। উচিত শিক্ষা হয়েছে! চোট লেগে পা টা গিয়েছে রীতিমত জখম হয়ে! সে কী কান্না বেচারার! ডাক্তারখানা থেকে



ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়ে নিয়ে এলো বাবলু। বাবলু বলে—দেখলি ত পরের দ্রব্য চুরি করার ফল !

ঠেকে শিখলো হাবুল। বলে—হ্যাঁ, সে-ফল হাতে হাতেই পেলুম।

বার্ষিক পরীক্ষা শুরু হয়েছে হাবুলদের স্কুলে। আজ হাবুলদের অঙ্কের পরীক্ষা। প্রশ্নপত্র পাবার পর সবাই উত্তর লিখতে শুরু করলো। মাষ্টারমশাই এসে বলে গেলেন—সবাই নিজে নিজে চেষ্টা করে জবাব লিখবে। কখনো অপরের সাহায্য নিতে চেষ্টা করবে না। আজ পরীক্ষার দিনে এই কথাটি মনে রেখো যে—অসাধুতা দুঃখ আনে।

সবাই শুনলে সে-কথা। হাবুলও শুনলে।

কিন্তু শুনলে কি হবে? না ঠেকলে হাবুল কখনো কি কিছু শেখে? পাশেই বিমলের খাতায় নজর করে হাবুল দেখে তার অঙ্কের ফলটা তো বিমলের ফলের সঙ্গে মিলছে না। তক্ষুণি সে ভেবে নিলে—



নিশ্চয় তাহলে আমার আঁকটা ভুল হয়েছে। তবে আর কি? আমার আঁকটা কেটে বিমলের আঁকটাই ঠিক ঠিক নকল করে দিই।



যেই কথা, সেই



কাজ। বিমলের ভুল আঁকটাই শেষ পর্যন্ত হাবুল নকল করে তার খাতায় লিখে দিলে। আসলে কিন্তু হাবুলের আঁকটাই শুদ্ধ হয়েছিল। ফলে কি হলো বুঝতেই পারছো। পরীক্ষার ফল যখন বেরুল, তখন দেখা গেল হাবুল অঙ্কেতে ফেল! তার বন্ধু বাবলু অনেক বেশি নম্বর পেয়ে ফার্ষ্ট হয়েছে।

পথে বাবলু তিরস্কার করে।



হাবুলকে বলে—কেন তুই অন্যের ভুল আঁক নকল করতে গেলি? স্যর যে বলেছিলেন—

বাবলুকে আর বলতে হলো না। হাবুলের তক্ষুণি মনে পড়ে যায় মাষ্টারমশাইয়ের উপদেশ। হাবুল বলে—হাঁ, তিনি ঠিকই বলেছিলেন—অসাধুতা দুঃখ আনে।

নিজে না ঠেকলে ত কোনো কিছু শিখবে না হাবুল। তুমি বন্ধুভাবে বারণ করো, উপদেশ দাও, কানেও নেবে না সে-উপদেশ। বিকেলে বাবলুর সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছে হাবুল। দু'বন্ধুতে বেড়াতে বেড়াতে মাঠের ওদিকে অনেকটা দূরে গিয়েছে। ওদিকে দেখে পাড়ার ডানপিটে ছোকরাগুলো দল বেঁধে কোথায় চলেছে। হাবুলকে দেখে ডেকে বলে—আয় হাবলু, জামরুল খাবি?



পাড়ার জমিদার-বাবুদের বাগানে আছে জামরুল গাছ। রীতিমত দারোয়ানের কড়া পাহারা সেখানে। জামরুল খেতে যাওয়া সেখানে সহজ নয়! বাবলু বারণ করে—উঁহু, কুসংসর্গে মিশিস্‌নে হাবুল, অনেক বিপদ আছে।

প্রতিবাদ করে হাবুল বলে—কেন, কি হবে কুসংসর্গে মিশলে ? আমি যদি ওদের সঙ্গে মিশে কোনো কুকাজ না করি, তাহলে মিশতে দোষ কি ?

বাবলুর বারণ শোনে না হাবুল। ডানপিটে ছোকরাগুলোর দলে ভিড়ে যায়। পথেই আগে থাকতে হাবুল সবাইকে বলে

রা খে—দে খো,
আমি তোমাদের দলে ভিড়ে পড়লেও চুরি করতে যাবো না কিন্তু।

ছোঁ ড়া গু লো বলে—বেশ, তুই তবে এখানে চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাক। আমরাই পেড়ে নিয়ে আসছি জামরুল।



একটা পড়ো বাড়ীর ভাঙা দেওয়ালের পাশে হাবুল দাঁড়িয়ে থাকে। ছোকরাগুলো চলে যায় জামরুল পাড়তে। খানিক বাদেই সোরগোল ওঠে—চোর চোর—ধর্ ধর্!

তাড়া খেয়ে—পালা পালা—বলে ছুটে পালালো ডানপিটেরা। হাবুল কী করবে ভেবে পায় না। বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকে সেইখানেই। দারোয়ান এসে কানটি পাকড়ে ধরতেই—ভ্যাঁ করে কেঁদে



ফেলে হাবুল।—আমি চুরি করি নি. অ্যাঁ—অ্যাঁ—অ্যাঁ

সত্যি কথাই বলেছিল হাবুল। কিন্তু দারোয়ান তা বিশ্বাস করবে কেন? হিড়্ হিড়্ করে কানে ধরে টেনে নিয়ে চললো তাকে—হাঁ হাঁ, চুরি করি নি! চল্ চল্ জামরুল চোর!

তারপরে একেবারে সিধে জমিদারবাড়ী! বাবলুই শেষে গিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে এলো হাবুলকে। সেখানে বাবলুর



খুব খাতির। পথে ফিরতে হাবুলের দু'চোখ ছাপিয়ে খালি জল আসছিল। কানটা তখনো তার টন্‌টন্‌ করছে। সত্যিই এবার ঠেকে শিখেছে হাবুল। বলে—এখন বুঝছি —কুকাজ না করলেও,—

বাকিটা বাবলুই ফের মনে করিয়ে দেয়—হ্যাঁ,—কুসংসর্গে মেশা উচিত নয়!

এর কিছুদিন পরে। কুটুম-বাড়ী থেকে বড় এক চ্যাঙারি মিঠাই এসেছে। সবে সবার দুপুরের খাওয়া শেষ হয়েছে। চ্যাঙারিটা লোকের হাত থেকে নামিয়ে নিয়ে মা বললেন—এখন রেখে দি, ওবেলা সবাইকে খেতে দেবো।

জানালা দিয়ে এক নজর দেখে নিলে হাবুল। তারপর মনে মনে কি একটা



মতলব এঁটে মুখে শুধু বললে—হুম্! অর্থাৎ এই ফাঁকেই আমার নিজের জন্য একটা ব্যবস্থা অবিশ্যি করে নিতে হবে।

চিরটা কালই হাবুলের নোলাটা বড়। সুতরাং আজকের এ সুযোগ কিছুতেই ফস্কাতে দেবে না সে। মা যত্ন করে চ্যাঙারিটা নিয়ে গিয়ে বড় ঘরের খাটের তলায় রেখে দিলেন। পরে দরজায় শেকল এঁটে অন্য কাজে চলে গেলেন।

ওৎ পেতেই ছিল হাবুল। মা বেরিয়ে যেতেই গা ঢাকা দিয়ে সুর্-সুর্ করে একটা চেয়ার টেনে এনে তাতে উঠে শেকলটা খুলে ফেললে। তার পর ঘরে ঢুকে ভেতর থেকে দরজা এঁটে সিধে খাটের তলায়। টেবিটা

কিন্তু ওর পিছু ছাড়েনি।

চ্যাঙারি থেকে একটা মিঠাই মুখে তুলে দিয়ে আর লোভ সামলাতে পারে না হাবুল। নোলায় জল গড়াতে থাকে।



ভাবে—বিকেলে সবার সঙ্গে ভাগ পাবার আশায় বসে থাকলে, তার ভাগ্যে যতটুকু জুটবে, তা পেয়ে সে সন্তুষ্ট হবে না কখনোই। কাজেই এই সুযোগে পেটটা ভরিয়ে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। টেবির কিন্তু অতো লোভ নেই। এতক্ষণ দেখছিল সে হাবুলের কীর্তি-কলাপ। হাবুলের ফেলে দেওয়া একটা মিষ্টি চেখে কখন হয়তো বা সে ঘুমিয়েই পড়েছে।

খেয়ে খেয়ে যখন সত্যিকারের আশ মিটলো হাবুলের, তখন চ্যাঙারিতে মাত্র



গুটি কয়েক মিষ্টি প ড়ে রয়েছে। ব্যস্! আর কি? সবার অলক্ষিতে এবার হাবুল ঘরের বার হয়েই হাওয়া!

বিকেলে যখন মা আবিষ্কার করলেন চ্যাঙারির এই অবস্থা, তখন তিনি কিছু জিজ্ঞেস না করতেই হাবুল নেহাৎ গোবেচারির মতো অনায়াসেই বলে ফেলে—আমি কিচ্ছু জানিনে মা, হয়তো এ আর কারো কীর্তি।

মা এবার আরো স্পষ্ট করে শুধোলেন—মিঠাইগুলো তবে তুই খাস্‌নি?

দু'হাত ঘুরিয়ে হাবুল বলে—না, কক্ষণো না মা!

মা বুঝতে পারলেন ব্যাপারটা। কিন্তু আর কিছু না বলে চেপে গেলেন।



ঐটুকু ছেলের এক চ্যাঙারি খাবার পেটে সইবে কেন? রাত্তিরের দিকে পেটের যন্ত্রণায় হাবুল অস্থির! চীৎকার করে কাঁদে—চুরি করে আর খাবো না, মা—আ-আ-আ!

মা মনে মনে বললেন—যেমন কর্ম তেমনি ফল! আর তার জন্যে করলেন ঝাঁঝালো অষুধের ব্যবস্থা। বাবলু কিন্তু গোড়া থেকেই সব লক্ষ্য করে আসছিল। এবার সে হাবুলের অবস্থা দেখে, আর নিজের মুখে চুরি করে খাওয়ার কথা বলতে শুনে জানালার ওধার থেকে শুধু বললে—হুম্! অর্থাৎ উচিত শিক্ষা!

পূজোর বাজার করতে বাবা আজ কলকাতায় যাবেন। বিকেল পাঁচটায় গাড়ী। এবেলাই বাবা তাই সুটকেশটা গুছিয়ে রাখছেন। হাবুল এসে বায়না ধরে—তোমার সঙ্গে আমিও কলকাতায় বেড়াতে যাবো বাবা !



অনেক দিন আগে একবার এমনি বাবার সঙ্গে হাবুলের কলকাতায় যাবার কথা ছিল। কিন্তু কী একটা অসুবিধার জন্যে তিনি হাবুলকে সঙ্গে

নিয়ে যেতে পারেন নি সেবারে। তাই তিনি এবারে আর আপত্তি না করে বললেন—বেশ, তাহলে বিকেল পাঁচটায় তৈরী থেকো। পাঁচটার ট্রেনে আমি রওনা দেবো।

হাবুল খুশী হয়ে চলে গেল।

পাঁচটায় যখন বাবা কলকাতায় রওনা দেবেন, তখন কোথায় হাবুল? এ-তল্লাটে তাকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। সে তখন খেলার মাঠে আর সব ছেলের সঙ্গে কানামাছি খেলায় মশগুল! ঠিক পাঁচটা বাজতেই হঠাৎ বাবলুর সেকথা মনে পড়লো। বাবলু বললে—পাঁচটা বাজে, তুই না আজ কলকাতায় যাবি হাবুল?



হাবুলকে তখন

খেলার নেশায় পেয়ে বসেছে। আন্‌মনা ভাবেই সে জবাব দেয়—হি-হি-হি-হি, হাঁ, এই যাই !

পরে যখন হুঁস হলো, তখন সে সিধে ছুটলো ষ্টেশনের পানে। গাড়ী তখন ছেড়ে দিয়েছে। ঊর্ধ্বশ্বাসে গাড়ীর পেছনে দৌড়ুতে দৌড়ুতে চীৎকার করে সে বাবাকে ডাকে—বাবা, আমার যাওয়া হলো না।

গাড়ী থেকে গলা বাড়িয়ে বাবা সব দেখছিলেন। চেঁচিয়ে জবাব দিলেন—না, তোমার যাওয়া হলো না। তুমি গাড়ী ফেল করলে।



হতাশ হয়ে পথের মাঝেই বসে পড়লো

হাবুল। বাবলু পেছনেই এসেছিল, সান্ত্বনা দিয়ে বললে—সময়ে সব কাজ না করলে, বনে এর চেয়ে বেশি ঠকতে হবে।



হাবুলও আজ স্বীকার করে তা। জলভরা চোখে বলে-ঠিক বলেছ।

আগেই তোমরা-জেনে রেখেছ যে, হাবুল কাউকে মিষ্টি কথা বলতে শেখে নি। সবার সঙ্গেই তার রূঢ় ব্যবহার। আজ বিকেলে এক সত্যিকারের বুড়ো ভিখিরী লাঠিতে



ভর করে ওদের দোরগোড়ায় এসে ভিক্ষে চাইলে—ভিখিরীকে কিছু দান করো দাতা!

আওয়াজ শুনে হাবুল দরজা খুলে ভিখিরীকে দেখতে পেয়ে মুখ ভেংচে বলে- -এখানে কিচ্ছুটি হবে না, যাও

নিরাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছিল ভিখিরী। পথে হঠাৎ হাবুলের বাবার সঙ্গে দেখা। কলকাতা থেকে তখুনি ফিরছেন তিনি। হাবুলের কথাগুলো তাঁর কানেও গিয়েছিল। ভিখিরীকে তাঁর দোরগোড়া থেকে শুধু হাতে ফিরতে দেখে শুধোলেন—কিছু পেলে না?

ভিখিরী বললে—না কর্তা, খোকাবাবু



চলে যেতে বললেন।

বাবা আর কিছু না বলে হাবুলের জন্যে কলকাতা থেকে যে জামা এনেছিলেন, তাই বার করে ভিখিরীর হাতে তুলে দিলেন। বললেন—খোকাবাবুর এই নতুন জামা নাও। ওর শাস্তি ও শিক্ষা—দুই-ই হবে।



দু'হাত পেতে জামাটি নিয়ে প্রার্থনা জানালে ভিখিরী—ভগবান ওকে সুবুদ্ধি দিন।

ভিখিরী চলে

গেল। এদিকে বাড়ীর ভেতরে পড়ে যায় আনন্দের হুলস্থূল! বাবা কলকাতা থেকে সবার জন্যেই এনেছেন এক একটা জিনিস। তাই তিনি বার করে দিলেন সবাইকে। হাবুলের ছোট বোন মিকির জন্যে খেলনা। খোকনের জন্যে রবারের পুতুল।—এমনি আরো কত কি? হাবুল সবার জিনিসগুলোর দিকে ফ্যাল্-ফ্যাল্ করে চেয়ে রইলো শুধু। মিকি বললে—বাবা কলকাতা থেকে কত কি এনেছেন। তুমি কিন্তু কিচ্ছু পেলে না।

অস্বীকার করতে পারে না হাবুল। কিন্তু শিক্ষাও ওর যথেষ্ট হয়েছে। তাই সহজ ভাবেই সে জবাব দেয়—আমি ওসব কিছু পাই নি বটে, কিন্তু আমি



পেয়েছি শিক্ষা—দীন দুঃখীকে দান করা উচিত।

এরপরে তোমরা কি কেউ হাবুলকে দেখেছ? দেখলে নিশ্চয়ই অবাক হয়ে যাবে। সে হাবুল আর হাবুলই নেই। একেবারে নতুন মানুষ! আজকাল সে কারো অন্যায় বা অনিষ্ট কখনো করতে যায় না। বরং সাধ্যমত সকলের উপকার করতে চেষ্টা করে। গুরুজনেরা যা বলেন, মন দিয়ে তা শোনে। লেখাপড়ায় ক্লাসে এবার হাবুলই হয়েছে ফার্ষ্ট। আজকাল সবার মুখেই হাবুলের প্রশংসা।

তবু এতোদিনের অভ্যেস কিনা, মাঝে মাঝে দু'একটা ভুল করে বসে হাবুল। তার জন্যে ন্যায্য শাস্তিও সে নিজেই মাথা পেতে নেয়।

এই সেদিনকার কথাই বলি। সকালে ক্লাসের একটা পড়া জেনে নিতে বাবলু এলো হাবুলের কাছে। দেখে হাবুল দেয়ালের দিকে মুখ করে এক পায়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এটা তার মেজদার দেওয়া শাস্তি।

বাবলু এসেছে—বুঝতে পেরে দেয়াল থেকে মুখ না ফিরিয়েই বলে হাবুল—চেয়ারখানা এনে বোস, বাবলু!

বাবলু চেয়ার টানতে টানতে শুধোয়—এ তোর কিসের সাজা রে হাবুল?



খুব সহজ ভাবেই হাবুল জবাব দেয়—সকালে মুখ ধুতে দাঁত মাজি নি, তাই—

হাবুল ত আর

সে হাবুল নেই, তাই দাঁত না-মাজার মত ছোটো-খাটো দোষের জন্যেও যা শাস্তি, তা-ও সে ন্যায্য প্রাপ্য বলে মেনে নেয়।



হাবুলের পাশে চেয়ারটা এনে বসে বাবলু শুধোয়—কতক্ষণ এম্‌নি ভাবে থাকতে হবে?

হাবুল — পনের মিনিট।



খুব গম্ভীর ভাবে বিজ্ঞের মত বাবলু বলে—তা এ সাজাটুকু তোর পাওয়া উচিত।



হাবুল বলে—
!

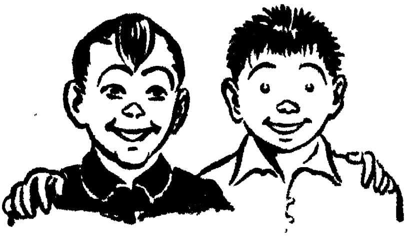
হাবুল যে তার এতটুকু অন্যায়ও এখন বুঝতে পারে এবং তার জন্যে তার গুরুজন তাকে যে শাস্তিটুকু দেন, তা সে খুশী মনেই মেনে নেয়,—এ থেকেই কি বোঝা যায় না যে, ঠেকে ঠেকে হাবুল সত্যি এবার বুঝতে শিখেছে যে, কী করে ভালো ছেলে হওয়া যায়!

সত্যিই হাবুল ঠেকে শিখেছে। এবং ঠেকে শেখা ভালো। তাহলে তা অনেক দিন বেশ মনে থাকে। কিন্তু তারো চেয়ে ভালো—দেখে শেখা। তাতে অযথা কতকগুলো কষ্ট পেতে হয় না। যেমন ধরো—অসাবধানী বলে তাকে বেঞ্চের ওপর দাঁড় হতে হয়েছে। সব দিকে চোখ রেখে

চলে না বলে গাছের গুঁড়িতে হোঁচট খেয়ে মাথায় চোট পেয়েছে। বাছুরকে অযথা কষ্ট দিতে গিয়ে গরুর শিংয়ের গুঁতোয় মাথা কেটে গিয়েছে। আম চুরিতে ঠ্যাং ভেঙেছে। বাসন মেজেছে, কানমলা খেয়েছে—এমনি আরো কতো সব! তোমরা তো সে-সব জানোই!

এ ছাড়া এসবের সঙ্গে লোকের গালমন্দ তো আছেই! এসবের জন্যেই তো কেউ হাবুলকে কখনো ভালো বলে নি। এসব করা কি ভালো?

হাবুল যদি কারো দেখেই আগে থেকে এসব শিখে সাবধান হতো, তাহলে অযথা এতো সব কষ্ট তাকে পেতে হতো না। যাক্, ঠেকে শেখা তবু মন্দের ভালো। হাবুল ঠেকে ঠেকেই শিখেছে! তোমরা কিন্তু শিখবে ঠেকে নয়—হাবুলের দেখেই, কেমন?





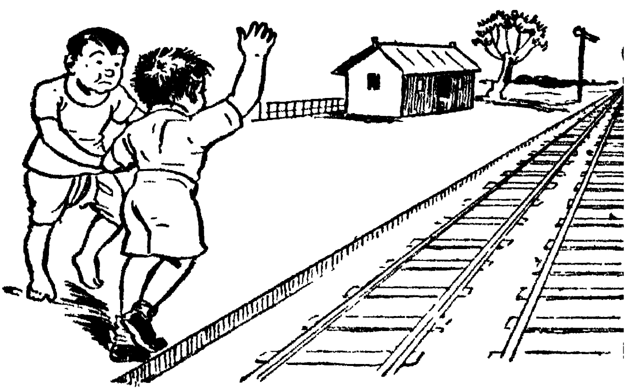
ঠেকে হাবুল শেখে

দেড়-আঙুলে হাবুল ছোঁড়ার
　　দেমাক বড়—দেমাক বড়,
একরত্তি ছেলেটুকুন,
　　মেজাজ যেনো কেমন তরো !
কথায় কথায় বোঝায়—কোথায়
　　নেই যে তাহার জমিদারী,
সবাই যেনো প্রজা তাহার,
　　খাস-তালুকে বসত তারি।
তাহার কথার একটুখানি
　　বাদ-প্রতিবাদ করতে মানা,
প্রতি কথায় 'সাহেব'—'হুজুর'—
　　বুজরুকী চাই ষোল আনা।

দেখলে তারে সেলাম ঠোকো,
পাশ কাটাতে সেলাম চাহি,
কেনা গোলাম সবাই তাহার,
তার হুকুমের আজ্ঞাবাহী।

বাবা যাবেন কলকাতাতে,
পৌঁছে দিতে ইষ্টিশনে
বাড়ীর চাকর ভোলায় নিয়ে
চললো হাবুল ফুল্লমনে।
ন'টার গাড়ীয় চাপেন বাবা,
বাজিয়ে বাঁশি ছাড়লো গাড়ী,
তাকিয়ে হাবুল সেদিক পানে
বিদায় জানায় রুমাল নাড়ি।
ঝক্-ঝক্-ঝক্—ধোঁয়া ছাড়ি
ক্রমেই গাড়ী মিলিয়ে গেল,
চেয়ে চেয়ে হাবুলবাবুর
দৃষ্টি হলো এলো-মেলো।

মজার ব্যাপার বলছি শোনো,—
সেদিক থেকেই আরেকখানি
লোকাল গাড়ী আসতে দেখে
চেঁচায় হাবুল ভোলায় টানি—
ভুলেই বাবা হয়তো কিছু
ছেড়ে গেছেন কাজের ভিড়ে,
তাইতে দেখো বাবার গাড়ী
ঐ তো আবার আসছে ফিরে।



কতো রকম বুঝিয়ে বলা,
উঁচিয়ে গলা আর না নড়ে,
বলে—বাবা ফিরিয়ে গাড়ী
আসেন তবে কিসের তরে?

লাট কি বেলাট নয়তো বটে,
রেলের বড় সাহেব নহে,
সবাই ভাবে—কে এর বাবা ?
আবোল-তাবোল কী সব কহে ?

আরেক দিনে—একাই হাবুল
বেড়াতে যায় মাঠের বুকে,
একটা ধাড়ি ভেড়া সেথায়
খাচ্ছিল ঘাস মনের সুখে।
ভারী মজা ! খেলবে বলে
এগোয় হাবুল কৌতূহলে,
নুইয়ে মাথা ভেড়া তখন
কয়েকটা পা পেছিয়ে চলে।
হাবুল ভাবে—মানী লোকের
মর্যাদা ঠিক ভেড়াও বুঝে,
সসম্ভ্রমে পেছিয়ে সে তাই
সেলাম জানায় শিরটি গুঁজে

তারপরে কি ঘটলো জানো ?
অমনি ভেড়া আসলো ফিরে,
একটি ঢুঁয়ে হাবুলবাবুর
মান-সম্মান তুললো শিরে।

